☆ 'সংগতি' কবিতায় আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁর [illegible] বৈপরীত্যের মাঝে কেমনভাবে সংগতি আনার চেষ্টা করেছেন সে সম্পর্কে আলোচনা কর।

⇒ কাল সচেতন সমাজমনস্ক আধুনিক কবি অমিয় চক্রবর্তীর 'অভিজ্ঞান বসন্ত' কাব্যের অন্যতম কবিতা হল 'সংগতি'। এই কবিতায় তিনি গভীর দার্শনিক প্রজ্ঞায় আলো-কালো, পাপ-পুণ্য, বৃষ্টি-সৃষ্টি, জীবন-মৃত্যু প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী ভাব ও বস্তুসমূহের মধ্যে এক গভীর সংগতি আবিষ্কার করলেন, তাঁর কাব্যজীবনের বীজমন্ত্র যেন সংগতি, জীবনে অসংগতি বেশী, চারিদিকে বৈষম্য, হানাহানিতে মত্ত পৃথিবীর সমস্যা মেটাবেন কে, সেই অজ্ঞাত শক্তি যাকে আমরা বলি জগদীশ্বর। বিধাতাপুরুষ তিনিই জগতের সমস্ত ভালোমন্দকে মিলিয়ে দেবেন ঐক্যের বন্ধনে।

1 ১৯৪২ এর দুর্ভিক্ষে যখন অভুক্ত বিপন্ন মানুষ দলে দলে খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে শহরে চলে আসে সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই কবি এই কবিতাটি রচনা করেন, তিনি দেখেন প্রবল বন্যার ধ্বংসলীলা চলে একদিকে; আর অন্য দিকে প্রকৃতির খেয়ালীপনায় দেখা যায় অনাবৃষ্টির সর্বনাশা রূপ, Tomas Hardy-র বিখ্যাত কবিতা 'The Darkling Thrush' এর সঙ্গে 'সংগতি' কবিতার সাদৃশ্য দেখা যায়,

অমিয় চক্রবর্তী মরমীয়াবাদ বৈজ্ঞানিক বোধে উদ্বুদ্ধ, 'সংগতি' কবিতায় 'ঝোড়ো হাওয়া' পৃথিবীর 'বলদর্পী' জাতের প্রতিনিধি, এই ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়ির ভাঙা দরজাটা তিনি মেলাবেন। এই দুই বস্তুই সাবলীল ভঙ্গিতে প্রতীক হয়ে ওঠে কবিতার শেষে, তখন ঝোড়ো হাওয়া হয়ে যায় প্রগতিশীল চেতনাসম্পন্ন নবীন আর পোড়ো দরজা হয়ে ওঠে অন্ধকারে বদ্ধ করা খাঁচায় আবদ্ধ প্রাচীন, এপ্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'সবুজের অভিযান' কবিতার নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব এবং নবীনের জয়লাভের কথা, কিন্তু এ কবিতায় উভয়ের দ্বন্দ্ব নয়— দ্বন্দ্বশেষে মিলন দেখানোই কবি-অভীপ্সিত, —

" দেবতা দনুজ নিয়েছে আপন বাঁটে,
সৃষ্টি বাঁচায় মৃত্যুর পথে হাঁটে,
অসংখ্য দীর্ঘ অসংখ্য এলোমেলো কাঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন। "

এখানেই রবীন্দ্র কবিতার থেকে অমিয় চক্রবর্তীর স্বাতন্ত্র্য নিরূপিত,

তিনি অতিবৃষ্টির বন্যা আর অনাবৃষ্টির খরাকে মেলাবেন, কারন উভয়ের সৃষ্টিকর্তা একজনই, তাঁর থেকেই সব কিছুর সৃষ্টি, তাই

Scanned with CamScanner

আপাত দৃষ্টিতে যাদের বিপরীত বলে মনে হয় তা আসলে সেই পূর্ণের দুই অংশের রূপ, বর্তমান বিধ্বংসী তাণ্ডবের চারিদিকে দেখা যায় প্রলয়, বন্যা, মারি, মড়ক, এগুলিও একদিন পৃথিবী থেকে ধ্বংস হবে, বিলুপ্ত হবে, সমস্ত অন্তরের পারে আসবে তার নিবিড় মেলবন্ধন, তাই তৃতীয় স্তবকে কবি বলেছেন ——

"তোমার আমার নানা সংগ্রাম
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।"

'জীবনমোহ' জীবনকে অভ্যাসের দাসে পরিণত করে, অথচ জীবন অর্থে উদার-দৃষ্টিযুক্ত মনুষ্যত্ব-বিশিষ্ট জীবন — সে জীবন ঢাকা পড়ে যায়, সে মানুষ প্রতিবাদহীন অথচ অন্তরে স্বপ্নবিলাসী — সুদিনের প্রত্যাশী, সঙ্গী হারানো পাখি নানা রঙের পাখা মেলে আকাশে উড়ে বেড়ায় নিষ্প্রাণ অভ্যাসে, এভাবে প্রাণশক্তি ও নিষ্প্রাণকে মিলিয়ে দেবেন তিনি, কবির এই কবিতায় সাঙ্গীতিক শব্দ ও ছন্দগত ধ্বনিস্পন্দন 3
2 যেন নৃত্যের তালে চলা অপ্সরীর মতো, আবার সেই আলোর ভুবনকে এনেছেন যেখানে আছে harmony, যার প্রাণ নেই সেই জীবনমৃতের তাৎপর্যহীনতাকেও মিলিয়ে দেবেন বিশ্বপিতা, সুর বেসুর সবই মিলে যাবে তার ঐকতানে।

সমাজ কাঠামোয় এক বড় পার্থক্য ধনী ও নির্ধনে, ধনীর গাড়ি এগিয়ে চলে সম্মুখে অপ্রতিহত ভাবে — তাদের রাস্তা ছেড়ে দেয় সাধারণ মানুষ যাদের কবি বলেছেন 'লোকগুলো', কেউ কেউ কাতর ও অসহায়, আবার কেউ কেউ কঠিন ও উদ্ধত, ধনবণ্টনের অসাম্য কেউ মুখ বুজে মেনে নেয়, কেউ করে প্রতিবাদ, কবির বিশ্বাস সর্বনিয়ন্তার অমোঘ ইচ্ছায় একদিন এই ধনবণ্টনেরও সাম্য আসবে, সমাজের জাতপাতের বেড়াকেও একদিন ভাঙবেন তিনি, সুতরাং 'স্বজাতি' কবিতায় রয়েছে দুই বিপরীত ভাবের বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান কামনা।

এই কবিতায় কবির আশ্চর্য গভীর আস্তিক্য বোধ ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় সমৃদ্ধ হয়েছে। টি. এস. এলিয়ট যেমন ঈশ্বর চেতনাতে সারা জীবন চেয়েছেন তেমনি আমাদের কবি অমিয় চক্রবর্তীও সগুণ ব্রহ্মের লীলাবাদে বিশ্বাসী, এই বিশ্বাসহীনতার যুগে এ আমাদের এক বিশেষ প্রাপ্তি, এই কবিতাটি পাঠকের কাছে নিয়ে আসে এক প্রশান্তি ও আস্তিক্যবোধ, প্রায়

রবীন্দ্রিক উচ্চারণে যেন কবি জানাতে চান এই বিশ্বের 'মৃত্যু, শোক, ক্ষয়, ক্ষতি শেষ সত্য নয়', পরস্পর অসঙ্গতির চিত্রমালা এঁকে কবি বোঝাতে চান পৃথিবী এমনই, কিন্তু তার পরেও আছে সংগতির দৈবীরূপ, ভাষাহারা বুকে আছে স্বপ্নের বিদ্রোহ, তাঁর এ কবিতা এজরা পাউন্ডের মতোই mask পরা কবিতা, তাই বলা যায় আশাবাদী কবি সংসারের গতানুগতিকার বিরোধ ও মিলন সব কিছুকেই মিলিয়েছেন অত্যন্ত সুচারুভাবে 'সংগতি' কবিতায়।

=

3

★ উটপাখি কবিতার মূলভাব আলোচনা কর।

→ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত আধুনিক কবি হলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, তাঁর কাব্যরচনার কালে পৃথিবীজুড়ে ছিল ঝড়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ — এই সময়কালেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি লিখিত। একদিকে সমকালীন নানা ঘটনা এবং অন্য দিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য। সেই যুগের পাশ্চাত্য সাহিত্যকে প্রত্যক্ষ করে সুধীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন নিঃসঙ্গ, যন্ত্রনাদগ্ধ — নাগরিক জীবনের কবি, তাই তাঁর কাব্যে নগর জীবনের যন্ত্রনাও প্রকাশিত,

'উটপাখি' কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ কবিতা, ১৯২৯ সালে অমঙ্গলহীনতার যে সংকট দুর্ভিক্ষ হয়ে এসেছিল সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই কবিতাটি লেখা, 'উটপাখি' নানা রূপকে, নানা প্রতীকে চিত্রিত হয়েছে এই কবিতায়, উটপাখি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেমানান সামঞ্জস্যহীন একটি পাখি, নাম তার পাখি হলেও সে মোটে উড়তে পারে না, এই উটপাখি কে কবি মনুষ্যত্ব আদর্শহীন, প্রতিবাদ হীন ক্ষীণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে তুলে ধরেছেন, পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া যুদ্ধ, মারী, মন্বন্তর, মূল্যবোধ বদলানোর হাওয়াকে মধ্যবিত্ত সমাজ সচেতন ভাবে এড়িয়ে চলে নিজ স্বার্থচিন্তা হবার তাগিদায়। উটপাখির জীবনেও এ ঘটনার সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, মরুভূমিতে যখন ঝড় ওঠে তখন বালির মধ্যে মুখ গুঁজে সে এই প্রতিকূলতায় নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে, — প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টাও সে করে না,

কিন্তু কবিতাটির বক্তা ভিন্ন ধরনের মানুষ, বস্তুবাদী ও ব্যবহারিক বুদ্ধি সম্পন্ন এই মানুষটি যেন বাস্তব সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন, — কল্পনাবিমুখ এবং আকাঙ্ক্ষিত আদর্শে বিগতমোহ, এই বাস্তববাদী মানুষ উটপাখি রূপী বাস্তববিমুখ কল্পনাবিলাসী মানুষদের প্রতি বন্ধুর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছে, পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করেছে — "নিষাদের মনে মায়ামৃগে রাজে নেই;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ,
....
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে;
....
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে,"

নিষাদরূপী মনুষ্যত্বহীন প্রাতিষ্ঠানিকদের হাত থেকে সাধারণ মধ্যবিত্তের নিস্তার নেই, কেননা একদিকে সে যেমন উচ্চবিত্তের আসনে ঠাঁই পায় না — অন্যদিকে নিজের নিচু স্তরে থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে এসেও সবার থেকে আলাদাই — তাই পৃথক, উটপাখিও এক অর্থে

প্রজাতির প্রতীক, তার সমগুলের জাতকেরা একে একে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, এখন উটপাখিটি একক —

"প্রাক্ পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা।"

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন পাশ্চাত্যের কবি মালার্মের ভাবশিষ্য। মালার্মে যেমন ছিলেন প্রতীক ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত তেমনি কবিও উটপাখির প্রতীক ব্যবহারে তাঁর কবিতাকে শিল্পসার্থক করে তুলেছেন। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে কবি মধ্যবিত্তের পুরানো অভিশপ্ত মূল্যবোধকে ফাটা ডিমের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যুগের বন্ধ্যাত্ব ও মরুভূমির শূন্যতা মিলেমিশে একাকার হয়েছে এই কবিতায়, তাই শ্লেষভাষায় কবি উটপাখি প্রতীকী মধ্যবিত্তকে বলেন —

"ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কি ফল পাবে?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।"

মধ্যবিত্ত সমাজের অস্তিত্বের সঙ্কট দূর করার জন্য কবি অতঃপর তাকে বাস্তব পথের সন্ধান দেন, সব কিছু এড়িয়ে যে কিছু করা যায় না সে কথা জানিয়ে দেন তাকে। কবির নবতর পরামর্শ — 'নব সংসার পাতি গে আবার চলো' — বাস্তববাদী ও আদর্শবাদী মানুষের যৌথ জীবনযাপনের উদ্যোগ সফল হবে, এ প্রসঙ্গে 'নিভৃত' অথবা কণ্টকাকীর্ণ বনের উল্লেখ মনোযোগ আকর্ষণ করে, নব সংসারেও থাকবে দুঃখকষ্ট ও বাধাবিপদ থাকলেও — 'মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও'।

তৃতীয় স্তবকে কবির দৃষ্টিভঙ্গি একদিকে রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণতাকে আঘাত করেছে, অন্যদিকে রোমান্টিক মায়ামুগ্ধনের মেদুর ছায়াও লক্ষিত হয়েছে। মানুষ উটপাখিকে ধরে নিয়ে গিয়ে চিড়িয়াখানায় বন্দী করে অর্থোপার্জন করে কিন্তু কবি তাঁর পলাতক কল্পনালক্ষ্মীকে কাছে ডেকেছেন, তাকে এই আশ্বাস দেন যে তার সহায়তায় তিনি কেবল দৃষ্টিনন্দনকারী শিল্প গড়ে তুলতে চান, কিন্তু কবি বাস্তবে তা করবেন না — বরং মাটিতে খসে পড়া পালকগুলি দিয়ে প্রবাল শোভন বীজনে বানাবেন, তবে কখনো তার বুকের হাড় দিয়ে সুরসুধা তৈরীর কল্পনাকে আস্তিকদের মতো অন্তরে ঠাঁই দেবেন না। বিশ্বব্যাপী মন্দার সময়, ১৯২৯-এ সাধারণ মানুষেরা ধনী ও সুযোগসন্ধানী দালালদের দ্বারা শোষিত ও লুণ্ঠিত হয়েছিল — এদের কবি বলেছেন 'বণী' আর 'বুলবুলি'।

চতুর্থ স্তবকে কবি স্বীকার করেছেন এই দুর্দশার দায়িত্ব কারো একার নয়, উপযুক্ত সময়ে রুখে দাঁড়াতে না পারার জন্য কিছু মানুষ শোষণের পথে মুনাফা করেছে — কিন্তু সাধারণ ও মধ্যবিত্ত মানুষের উপর পড়েছে দেনা শোধ করবার ভার, কবিতাটির শেষে আশাবাদীর মতো কবি উপসংহার টেনেছেন —

'অতএব এসো আমরা সন্ধি করে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি;'

এই কবিতায় উক্ত দু ধরনের মানুষকে প্রথমে পরস্পরের বিপরীত বলে মনে হলেও তারা আসলে পরস্পরের পরিপূরক, এবং শেষের এই
6 দুটি পঙক্তিতে একে অপরের অপরিহার্য বলে মনে হয়।

'উটপাখি' কবিতায় কবি জীবনের নঞর্থক দিক থেকে বেরিয়ে আসার একান্ত প্রয়াস দেখিয়েছেন, বর্তমানের শূন্যতা ধূ ধূ করে মরুভূমির চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে, মানব জীবনের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে চাপা পড়ে গেছে, তাই অবলুপ্ত হয়ে আসা মরুভূমির বালুকার এক বিশাল পাখি হল উটপাখি, জীবনের শূন্যতা এবং অসহায়তা প্রতীকী ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করেছেন কবি 'উটপাখি' নামকরণের মাধ্যমে, তাই বলা যায় 'উটপাখি' হৃদয় সচেতন কবির যুগযন্ত্রণা প্রকাশক একটি বিশিষ্ট কবিতা।

6

যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব,' কবিতায় কবির জীবন দর্শন যে ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তা আলোচনা কর।

→ আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে এক আত্মমগ্ন কবি হলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব,' (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কবিতা হল 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব' কবিতাটি। জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে মৃত্যুকে কাছ থেকে দেখেছেন, জীবন মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে জীবনের দিকে ফিরে দাঁড়ানোই ভালো বলে মনে করেছেন কবি, কবিতার স্তবকে স্তবকে শব্দ বিন্যাসের মধ্যে আমরা জীবন চেতনার সুর খুঁজে পাই।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবির মধ্যে একাকীত্ব বোধ কাজ করেছে। তখন কবি প্রিয় জনকেও চিনতে পারেন নি, এক দুর্জ্ঞেয় জীবনতৃষ্ণা, অভাববোধের বেদনা, আর অস্তিত্বের সংকট কবিকে তখন তাড়া করেছে, ভালোবাসা, অবহেলা, ঘৃণা সবই কবির কাছে একাকার হয়ে গেছে, প্রিয়জনের প্রেম-ভালোবাসা পাচ্ছিল ও কাঁদমাত্র হয়ে পড়ে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

'এত কালো মেখেছি দু হাতে
এত কাল ধরে,
কখনো তোমার করে, তোমাকে ভাবি নি,'

পল ভেরলেন-এর মতো কবিও তখন 'alone', তাই মৃত্যু না জীবন কোনটা নিকট আত্মীয় কবি তা বুঝে উঠতে পারেন নি, সেজন্য নির্জন রাতে বাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে জীবনের মায়াকে অনুভব করেন, আর ঘুম থেকে উঠে রাতে একাকী গঙ্গার তীরে গিয়ে দাঁড়ালে মৃত্যুর ডাক শোনেন—

'এখনো বাদের পাশে রাত্তিরে দাঁড়ালে
চাঁদ ডাকে : আয় আয় আয়
এখনো গঙ্গার তীরে ঘুমন্ত দাঁড়ালে
চিতাকাঠ ডাকে : আয় আয়,'

'চাঁদ' হল জীবনের প্রতীক, আর 'চিতাকাঠ' হল মৃত্যুর প্রতীক, তাই জীবন মৃত্যুর মধ্যে কোনটি মোহনীয় সেটাই কবি স্থির করতে পারেন নি।

আধুনিক যুগে বেঁচে থাকা নিরঙ্কুশ আনন্দের নয়, খণ্ড খণ্ড মৃত্যু ব্যর্থতা ও অন্ধকার নিয়ে বর্তমান যুগের মানুষের বেঁচে থাকা, তবু সংসার বড়ো মোহময়, কবির মনের আকাঙ্ক্ষা হল, যেতে হলে

সংসারকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, ব একাকী যাবেন না, জরা আসুক, ব্যাধি আসুক, তবু সংসার তিনি ছাড়বেন না, তিনি চাইলেই একা যেতে পারতেন, কিন্তু কেন যাবেন, কোন দিকেই বা যাবেন, সংগ্রাম করেই কবি বেঁচে থাকবেন, তিনি জানেন চিত্রের পদ্মেতে ভ্রমর যেমন ভাবে আকৃষ্ট হয়, সংসারও তেমন ভাবে মানুষকে আকৃষ্ট করে, সংসার ছেড়ে যাবার ক্ষমতা কবির নেই,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন ——

' বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধনে মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ, "

ঠিক তেমনি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও জীবনকে সত্যরূপে গ্রহন করে সন্তানের মধ্যে জীবনের প্রেম ভালোবাসাকে রক্ষা করে জীবনকে সার্থক করে তুলতে চেয়েছেন, তাই চিতাকাঠ ডাকলেও সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে কবি তাঁদের ডাককেই গ্রহন করেছেন, সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে কবি ভুলেছেন জীবনের সব গ্লানিমা এবং বলেছেন ——

8 'সন্তানের মুখ ধরে একটি চুমো খাবো,'

বাৎসল্য প্রেমই কবিকে ঘুরে দাঁড় করিয়েছে, এই প্রেমই কবিকে মৃত্যুকে পেছনে ফেলে জীবনের দিকে পৌঁছে দিয়েছে। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে যে সত্য কবি দেখতে পান নি, সন্তানের দিকে তাকিয়ে কবি সেই সত্যকেই খুঁজে পেয়েছেন, খুঁজে পেয়েছেন জীবন সত্যকে,

এ কবিতায় সন্তান যেমন কবির, সব পিতার, অন্যদিকে সে আবার সর্বব্যাপ্ত ভবিষ্যতের কান্ডারী — তারই মধ্যে সব পিতার জীবন, বিশ্ব সংসারে চলে এই জীবনের গতি প্রবাহ, সংসার সেই জীবন নীড়, সেই নীড় ছেড়ে যে জীবনের সাধনা হয় না কবি তা বারে বারে বলেছেন, সৃষ্টিতে স্রষ্টার তাই লীলা, মায়াবাদী বৈরাগীর কাছে রবীন্দ্রনাথ কবিতাই জানতে চেয়েছেন ——

' লক্ষকোটি জীব মিলে এ বিশ্বের মেলা
তুমি ভাবিতেছ বসে সব ছেলেখেলা,'

সেই লীলার জন্যই কবির কাছে মৃত্যু অপেক্ষা জীবন বড়ো হয়েছে,

বেঁচে থাকার জন্য জীবনের অনন্ত শক্তিই হল জৈব শক্তি এবং কামনা, এই কামনা ও জৈব শক্তিকে ত্যাগ করার ক্ষমতা সাধারন মানুষের নেই, তাই কবি বলেছেন ——

' তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাব
একাকী যাব না অসময়ে,'

Scanned with CamScanner

[illegible] তত্ত্বের নিরিখে বলা যায়, সংসারে থেকে আসক্তির প্রবণতা স্বাভাবিক, জীবন চেতনার এটাই নিয়ম, একে অপরের কাছে থাকতে থাকতে মানবিক অস্তিত্বের যে বন্ধনে মানুষ বাঁধা পড়ে, সেই বন্ধনকে কেউই কাটাতে চায় না, এরই নাম হল আসক্তি।

Scanned with CamScanner

* 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতায় 'শঙ্খ ঘোষের' যে সমাজ চেতনার প্রকাশ ঘটেছে তা আলোচনা কর,

⇒ আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে কবি শঙ্খ ঘোষ এক অনন্য প্রতিভা, তিনি বিংশ ও একবিংশ এই দুই শতাব্দীকে স্পর্শ করলেও মূলত বিংশ শতাব্দীর সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে উপলব্ধি করেছেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন, যার ফলে 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতাটি, কবি শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্যগ্রন্থের সাতচল্লিশটি গীতি কবিতার মধ্যে পনের সংখ্যক কবিতা হল 'বাবরের প্রার্থনা,'

ইতিহাস অনুযায়ী পুত্র হুমায়ুন ভয়ংকর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে বাবর নিজের জীবনের বিনিময়ে আল্লার কাছে পুত্রের প্রাণ-ভিক্ষা চেয়েছিলেন, তাতে হুমায়ুন সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং তার কিছুদিন পরে বাবর মারা যান, ইতিহাসের এই কাহিনীকে কেন্দ্র করে শঙ্খ ঘোষ 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতাটি লেখেন, তবে ইতিহাসের এই তথ্যে জীবনরস সঞ্চয় করে কল্পনায় তাকে সমসাময়িক যুগোপযোগী করেছেন, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে কবির জীবন দর্শনের বিশেষ অনুভূতি, 'কবিতার মুহূর্ত'

10 গ্রন্থে কবি বলেছেন — ১৯৭৭ সালের শেষের দিকে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন কবির বড়ো মেয়ে, ডাক্তারেরা ভালো ধরতে পারছেন না রোগটি ঠিক কোথায়, কবির মন মন্থর হয়ে আছে, এই অবস্থায় যাদবপুর কলেজ প্রাঙ্গনে ফাঁকা জায়গায় পায়চারি করতে করতে হঠাৎ কবির মনে হয় মাটিতে জানু পেতে বসে মেয়ের জন্য প্রার্থনা করবেন, ঠিক তখনই কবির মনে পড়ে ইতিহাসের সেই পুরোনো গল্প : রুগ্ন হুমায়ুনকে ঘিরে বাবরের প্রার্থনা ঠিক এর পরেই কবি লিখে ফেললেন 'বাবরের প্রার্থনা' কবিতাটি,

ইতিহাসের কাহিনীকে আধুনিক পাঠকের উপযোগী করে গড়ে তুলেছেন শঙ্খ ঘোষ, বাবরের মতো কবি শঙ্খ ঘোষও নিজের কন্যার অসুস্থতায় ঈশ্বরের কাছেই হয়তো একই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন সম্রাট বাবর নয় — চিরকালের পিতা বাবরই এখানে বড় হয়ে উঠেছে সমালোচক যথার্থ মন্তব্য করেছেন — "যে কোনো পিতার, সমাজমনস্ক যে কোনো মানুষের প্রতিরূপ হিসাবে বাবরকে গ্রহণ করা যায়, সন্তান না সন্ততির উল্লেখে ব্যক্তির সীমা, দেশ কালের গণ্ডি যেন ভেঙে গেছে," সন্ততির মধ্যেই পিতা বেঁচে থাকেন যার উল্লেখ আমরা পাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে —

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে,'

কবির ভাবনা 'সুন্দরের আরাধনা', সুন্দরকে বরণ করতে বর্তমান পৃথিবীতে শান্তি আনতে বাবরের সঙ্গে কবিও জানু পেতে বসেন, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে তাঁর মনের প্রার্থনা জানান —

Scanned with CamScanner

'এই তো জানু পেতে বসেছি, পশ্চিম
আজ বসন্তের শূন্য হাত —
ধ্বংস করে দাও আমাকে যদি চাও
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।

'বাবরের প্রার্থনা' কবিতায় কবি হুমায়ুনের রোগক্ষীণ দেহকে দেখেছেন বর্তমানের ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতারূপে, যে সভ্যতার মধ্যে আছে ভোগোন্মুখী প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা, ভোগের পাপের জালে জড়িয়ে পড়ার অসহায়তা, বাবর যেন ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতারই জন্মদাতা; কিন্তু রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি তার নেই, এই কবিতায় শঙ্খ ঘোষ বাবরের রূপ নিয়ে বর্তমান যুগের ভোগবাদী মৃতপ্রায় অসুস্থ সভ্যতাকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে চান, কবি পুরাতন ঐতিহাসিক কাহিনির প্রেক্ষাপটে রচনা করেছেন নবযুগের সংগীত,

কবিতাটি শঙ্খ ঘোষ লেখেন ১৯৭৪ সালে, সত্তর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় কবিতাটি লেখা, পরিবর্তিত
11 সময়ে রাজনৈতিক বোধ অপেক্ষা মানবিক বোধই বড় হয়ে উঠে, শঙ্খ ঘোষ বাবরের মুখে যে কথাগুলি বসিয়েছেন — তা সমকালের অনেক বাবরেরই কথা, —

'কোথায় গেল ওর স্বচ্ছ যৌবন
কোথায় কুরে খায় গোপন ক্ষয়!
..................................!
পাথর করে দাও আমাকে নিশ্চল
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।'

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এবং স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে শঙ্খ ঘোষের কবি চেতনার বিকাশ ঘটেছে, জীবন সংগ্রাম আর মানবাত্মার অবক্ষয়কে তিনি প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করেছেন, স্বাধীনতার পরই ভারতবর্ষে মারী-বীজের মতো ছড়িয়ে পড়েছে কালোবাজারি, মুনাফাবাজ, দুর্নীতিগ্রস্ত নরপিশাচদের অবাধ লীলা — মনুষ্যত্ব হয়েছে নিষ্পেষিত, এক চরম অবক্ষয় ও ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে দেখলেন পুরোনো ঐতিহ্য এবং মানবিক মূল্যবোধ ভূলুণ্ঠিত, অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পাপের জন্য অনুশোচনা করা ছাড়া তখন আর অন্য কোনো পথ থাকে না, কবির কথায় —

'না কি এ শরীরের পাপের বীজাণুতে
কোনোই ত্রাণ নেই ভবিষ্যের?
আমারই বর্বর জয়ের উল্লাসে
মৃত্যু ডেকে আনি নিজের ঘরে?'

Scanned with CamScanner

মধ্যযুগের বীরযোদ্ধা সম্রাট বাবর এখানে বড়ো হননি, বড়ো হয়েছেন বিশ শতকের একজন ভীত সন্ত্রস্ত পিতা — যে রোগজীর্ণ পুত্রের জন্য ঈশ্বরের কাছে ধ্যানমগ্ন, পিতা বাবর এখানে অকপটে স্বীকার করেছেন নিজের পাপের কথা, সন্তানের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চান পিতা, কবি সেই ইতিহাস পুরুষের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে বলেন —

'ধ্বংস করে দাও আমাকে ঈশ্বর
আমার সন্ততি স্বপ্নে থাক।'

তাই 'বাবরের প্রার্থনা' যথার্থভাবে 'শিল্পসময়' উত্তরণের কবিতা;
12 সমাজের গভীর যন্ত্রণার কথাই অভিব্যক্ত হয়েছে এ কবিতায়।

═

'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতার মূলভাব ঃ — 13

⇒ ফুল ফুটুক না ফুটুক কবিতাটি আধুনিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি উৎকৃষ্ট উল্লেখযোগ্য কবিতা, এই কবিতাটিতে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এক আশাবিশ্বাসের চরম নিদর্শন ঘটিয়েছেন, পাশ্চাত্য কবি টি.এস. এলিয়টের মতো এ দেশের সব আধুনিক কবিরা যখন প্রায় গোটা পৃথিবী ব্যাপী Waste land ভাবতে শুরু করেছিল ঠিক তখনই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার কবিতায় নিয়ে এলেন এক গভীর আত্মবিশ্বাসের কথা মানুষের জীবনের যে নষ্ট সময়ের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে তা দীর্ঘস্থায়ী নয়, কবির দৃঢ় বিশ্বাস একদিন মানুষ স্বপ্ন আকাঙ্খা পূর্ণতার কাছে পৌঁছে যাবে, তাই সন্ধ্যা সময়ের মুখে দাঁড়িয়ে কবি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন —

'ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত,'

আধুনিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাম্যবাদে বিশ্বাসী, তাই তিনি মনে করেন চিরকাল মানুষের দুঃসময় যাবে না, এক সময় না একসময় মানুষ সুসময়ের কাছে পৌঁছে যাবে। কবি মানুষের জীবনে এক নতুন স্বপ্নময় আগামী দিনের ইঙ্গিত খুঁজে পান, তাই তিনি পোড়ো জমিতে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ আগামী দিনের সুস্থ সবল স্বপ্নময় উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন দেখছেন, সে স্বপ্ন হল মুক্তির স্বপ্ন, একবুক ভালোবাসার স্বপ্ন, কবি তাই সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের দিকে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ করেন স্বপ্নময় বসন্তের আগমন, বসন্তকে কবি পেতে চেয়েছেন মানবজীবনের পূর্ণতার প্রতীকে, কবি তাই ধৈর্যশীল গাছের মত বিধ্বস্ত সময়কে কাটিয়ে উঠে গভীর আত্মপ্রত্যয়ে অটুট থাকার একটি চিত্রকল্প তুলে ধরে বলেছেন —

শান বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।

Scanned with CamScanner

এই কচি কচি পাতার পাঁজর ফাটানো হাসির মধ্যে রয়েছে কবি মনের সুপ্ত জীবন কামনা এবং শুভ সময়ে উজ্জ্বল সময়ের আভাস, যা কবি মনে করেন শীঘ্রই আগত। এখানে 'শান বাঁধানো ফুটপাতে' এবং পাথরের পা ডুবিয়ে থাকা জীবন সংগ্রামে কঠিন বাস্তবতার পটভূমি, আর 'কাঠখোট্টা ও গাছ' হল সংগ্রামী মানুষের প্রতীক।

কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে পুনরায় কবি প্রথম স্তবকের পুনরাবৃত্তি করেন, তার কারণ এলিয়টের বন্ধ্যা কালকে কবি মানতে চাননি, কবি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন সময় যতই বিরুদ্ধ হোক না কেন একদিন তা বদলাবেই, তার এই বসন্ত কামনার মধ্যেই রয়েছে সফলতার আশ্বাস, তাই কবি শঙ্খ ঘোষের মতো —

'সমাজ বিপ্লবে সম্পূর্ণ হওয়ার দীপ্ত ভাষণ,'

কবিও চান সমাজ বিপ্লবের অংশীদার হয়ে স্থির লক্ষ্যে পৌঁছাতে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক কবিতায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় পরবর্তী স্তবকে সমাজের মৃত্যুর কিছু কালো দিনের কথা তুলে ধরেছেন, কিন্তু সেই অবক্ষয়িত মৃত্যুর কালো দিনকে কবি ধরে রাখতে চান না, মৃত্যুর অবক্ষয়িত দিন থেকে উত্তীর্ণ হতে চেয়ে বলেছেন —

'আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে —
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তোলে —
যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে।'

এখানে আমরা বুঝতে পারি কবি পেছনে ফেলে আসা কালো দিনগুলোর কথা ভাবতে চান না, মুক্তকণ্ঠের কঠিন সময়ে যে বীভৎসতা মানবসত্তাকে গ্রাস করে মৃত্যুর দিকে

14

ফিরে দেয়। সেই হেমন্তের দিনগুলি আর যেন মানুষের জীবনে নেমে না আসে, মানব সভ্যতাকে যে দিনগুলো ধ্বংস ও কলঙ্কিত করেছে তা আর ফিরে পেতে কবি চান না।

'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতায় কবি এর পরে দেখিয়েছেন একটি কালো মেয়ের জীবনে, বসন্ত প্রেমের আগমনের প্রতিচ্ছবি, কবি একটি আইবুড়ো মেয়ের ভাবনাকে আলপনার অর্থ দিয়ে বাস্তব জীবনযাত্রার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, সমাজের কাছ থেকে হারিয়ে যায় যেমন করে কোকিল ডাকে হরবোলার ছেলেটা, তেমনি ভাবে গায়ে হলুদ দেওয়া এই আইবুড়ো অন্তর্লীন বেদনা বিধুর স্মৃতি কবি সুন্দরভাবে অঙ্কন করেছেন, সেই আইবুড়ো মেয়েটির গায়ে বসে 'লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি', তখন মেয়েটি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়, আসলে এই প্রজাপতি তার জীবনে বসন্তের কথা মনে করিয়ে দেয়, কবি তাই বলেছেন —

'চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
আ মরণ,
পোড়ার মুখো লক্ষ্মীছাড়া প্রজাপতি!
তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দ,'

মনে রাখতে হবে এখানে আ মরণ কথাটির মধ্যে মেয়েটির অভিমানের কথা ব্যক্ত হয়েছে, এবং মেয়েটির মধ্যে একটা আলাদা মায়ার পরিবেশ তৈরী হয়, যে মায়ায় আইবুড়ো মেয়েটি সেই হরবোলা ছেলেটির মায়াময় ছবির কথা ভাবে, ভবিষ্যৎ আগত দিনের হাত ধরে তাকে চলতে হবে নতুন সোনালী স্বপ্ন বুনে নিয়ে, কালো মেয়েটির জীবনেও বসন্ত দেখার দিন কাছে ফিরে আসে।

Scanned with CamScanner

ফুল ফুটুক না ফুটুক কবিতার শেষ অনুচ্ছেদে কবি দেখিয়েছেন অন্ধকারের মুখ চাপা দিয়ে দড়ি পাকানো সেই গাছ তখনও হাসছে। এ কবি তাই আত্মবিশ্বাস পোষণ করে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন —

ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত।

আসলে গাছের এই মুখচাপা হাসি এক অর্থে প্রাণশক্তি, কবির বিশ্বাস যে জীবন কখনও থামে না। তবু আঁচ তো পাওয়া যায়, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখাটা এক রকম অবজ্ঞা। এই প্রাণশক্তি [illegible] বসন্তের সেই কালো দিনের প্রতীক, যা প্রাণশক্তির [illegible] আত্মপ্রকাশে এত বছর জীবন বিরুদ্ধতার মধ্যেও দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই কবিতাটিতে আইবুড়ো মেয়েটি মাথায় [illegible] প্রজাপতির আগমনে দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পর গাছের মুখ চাপা হাসি। এ জন্য কবি [illegible] প্রকাশে কবিতাটি সার্থকতা।

৯। 'জননী যন্ত্রণা' কবিতার মূলভাব লেখ। Mark 7

⇒ অমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'জননী যন্ত্রণা,' ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত এই কবিতাটি 'ক-টি কবিতা ও একলব্য' (১৯৫৯) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 'জননী যন্ত্রণা' একটি সার্থক দেশপ্রেমের কবিতা,

দুটি স্তবকে বিন্যস্ত আঠাশ পংক্তি সম্বলিত এই কবিতায় জননী বলতে কোনো ব্যক্তিক সম্পর্কের সূত্রে, গ্রথিত মাতৃত্বের সত্তা নয়, দেশমাতৃকার দুঃসহ জ্বালা যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত হয়েছে। গর্ভধারিনী জননী আর দেশ জননী মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে এই কবিতায়,

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর দেশ বিভাজনের যন্ত্রণা যেমন কবিকে ব্যথিত করেছে তেমনি দেশে স্বাধীনতার যে সোনালী স্বপ্ন একসময় কবি আত্মায় সুখস্মৃতি জাগিয়েছিল তা ছবি অচিরেই স্বপ্নভঙ্গে পরিনত হয়েছে। কবিতার শুরুতেই কবি সেই স্বপ্নভঙ্গের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে গিয়ে জানিয়েছেন—

" জন্মে জন্মে কান্না দিলে, দিলে ভাসান ভেলা
এ-কূল ও-কূল কাল বেলা কালনাগিনীর দহ
রাত সাজালে, একলা দিন ঢেউ এর ছেলে খেলা
সামনে যে জল জল পেছনে ভরা ডুবির ভয়, "

আসলে দেশ বিভাগের পর অগনিত মানুষকে বাসভূমি ত্যাগ করে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসতে হয়েছিল, যার যন্ত্রণা ক্রমশ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও স্পর্শ করে। দেশ বিভাগের পর দেখা যায় দিশাহীন হয়ে পড়ে হাজার হাজার জীবন, নির্দিষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ যেন অনিশ্চিত, কালনাগিনীর দহ হল পুরান কথিত একটি সরোবর যা কালনাগিনীর বিষে পূর্ণ, এই বিষরূপ সময়ের হাত থেকে কারো নিস্তার নেই, ভবিষ্যতের দিন গুলিকে মনে হয়েছে অথৈ জল, তাই ভরাডুবির ভয় পান কবি,

কবি এই কবিতায় তাঁর ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার দর্পনে দেখেছেন উদ্বাস্তু জীবনের ভয়ংকর অবস্থার কথা, উদ্বাস্তু জীবনের সকরুণ ফলশ্রুতিতে অজস্র মানুষ সেদিন বস্তিবাসী হয়ে সংকীর্ন পরিসরে

Scanned with CamScanner

মা বাবা, ভাই বোন, ছেলে বউ নিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল।

এরপর কবি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপন্ন জীবনের ছবিকে তুলে ধরেছেন —

'এক যে ছেলে জোয়ান ছেলে / কই সে ছেলে গেল
ঘর সে তোমার ঘরে ঘরে / জননী যন্ত্রণা।'

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত জোয়ান ছেলের শোকে শোকাতুর জননীর কথা তুলে ধরেছেন, এই জননী যন্ত্রণা কোনো ব্যক্তিক নয়, সমষ্টির, এই যন্ত্রণায় যেমন আক্রান্ত মা তেমনি দেশমাতাও তার বাইরে নয়।

কবি কেবল সময়ের সংকটকে তুলে ধরে ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি সংকটকে অতিক্রম করে চলার কথাও বলেছেন —

'ত[illegible]কে দিলাম [illegible] [illegible] হেলাফেলা
ত[illegible]কে দিলাম ভরা দুবি কান্না তো[illegible]র নয়।'

এই ক[illegible]র মধ্য দিয়ে কবি জীবন সং[illegible]মের মধ্য দিয়ে প্রতিকূ[illegible], অবস্থাকে জয় করে নেওয়া[illegible] কথাই ব্যক্ত করেছেন। আসলে কবির কা[illegible] পরাজয় [illegible] নয়, কড় নয় হতাশা, প্রকৃত[illegible] কবি ছিলে[illegible] [illegible] এবং তার সফলতায় বিশ্বাসী।

[illegible] কবি অশ্রুলাম[illegible] চট্টোপাধ্যায় যেহেতু একজন বিবেকবান কবি [illegible] তিনি [illegible] মুক্তির জন্য উৎসর্গীকৃত বীর প্রাণের প্রতি সম্মা[illegible] [illegible]রেছেন, দেশমাতা যেহেতু শোষণমুক্ত নয় তার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তার অন্তরে জেগে উঠেছে এক গভীর যন্ত্রণা; সেই আর্তিতেই কবিতার সমাপ্তি। — 'জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা।'

সবদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ব্যক্তি-সীমা অতিক্রমী সামাজিক চেতনা মণ্ডিত কবি কবিতাটির এক অনন্য সৃষ্টি হয়ে উঠেছে।

Scanned with CamScanner